Vol. 47 | No. 3 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব

Volume	47
Issue	3
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো: আবদুস সোবহান তালুকদার
Published online	June 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i3.5
Pages	৭৫-৯৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব

মো: আবদুস সোবহান তালুকদার*

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মূলত একটি প্রাকৃত প্রণয়োপাখ্যান। বিশেষজ্ঞদের অনুমান : এটি একটি যাত্রা পালা।[১] বাসলী দেবীর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় গীত হওয়ার উদ্দেশ্যে এটি রচিত হয়েছিল।[২] সাহিত্য-মূল্যে উঁচু দরের হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকৃত বিচারে ধামালি শ্রেণীর রচনা গ্রামের অশিক্ষিত, স্থূল রুচির দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দদানের জন্যই কাব্যটি রচিত হয়েছিল এ সম্পর্কে সমালোচকদের কিছু স্পষ্টভাষণ স্মরণীয়।

ক. কাব্যখানি গ্রাম্য শ্রোতার জন্য...[৩]

খ. এ কাহিনী আদিরসাত্মক বলিয়াই জনপ্রিয়।[৪]

গ. বসন্তবাবুর আবিষ্কৃত খণ্ডিত পুঁথির নাম রাধাকৃষ্ণের ধামালী বলিলে অধিকতর সঙ্গত হয়।[৫]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের সম্পূর্ণ কাহিনী হয়তো আর কোনো দিনও জানা যাবে না। কারণ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ একমাত্র যে পুঁথিটি আবিষ্কার করেছেন, সেটি খণ্ডিত। এ পুঁথির 'প্রথম দুখানি' এবং 'শেষের অন্ততঃ একখানি'[৬] পাতা পাওয়া যায় নি। পুঁথিতে বাংলা তুলোট কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে। উভয় পৃষ্ঠায় লেখার জন্য পুঁথির একটি পাতায় রয়েছে দুটি পৃষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথির ২২৬ পাতা অর্থাৎ ৪৫২ পৃষ্ঠার মধ্যে 'মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি।'[৭] এই হিসেবে পুঁথি থেকে খোয়া গেছে প্রথমের দু পাতার ৪ পৃষ্ঠা, শেষ পাতার ২ পৃষ্ঠা এবং মাঝের ৪৫ পৃষ্ঠা = ৫১ পৃষ্ঠা। মাঝের এই ৪৫ পৃষ্ঠা একটানা নয়; ১৩টি খণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ৪০৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে ৪১৮টি পদ। সুতরাং এই অনুপাতে খোয়া যাওয়া ৫১ পৃষ্ঠায় আরো অন্তত ৫২টি পদ থাকার কথা। পুঁথি খণ্ডিত বলে এখানে পদ সংখ্যা ৪১৮, পূর্ণাঙ্গ পুঁথিতে পদসংখ্যা (৪১৮ + ৫২) ৪৭০ থাকার কথা।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনী নাটগীতের আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর বহির্কাঠামোতে অর্বাচীন কালের বিভিন্ন পুরাণের অস্পষ্ট/বিভ্রান্তি পূর্ণ/পরস্পরবিরোধী অনুসৃতি দূরবর্তী ক্ষীণ ছায়া ফেললেও মূল কাহিনীটি একটি লোকজ প্রেমকাহিনী। অরবিন্দ পোদ্দারের ভাষায় :

> ...রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলা তাঁর কাব্যের উপজীব্য হলেও এই প্রেম সর্বভাবে অলৌকিক অথবা অতিপ্রাকৃত জগতের স্পর্শবিমুক্ত। এখানে সেখানে কৃষ্ণের

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> জবানিতে তাঁর অলৌকিক ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা এবং পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের অলৌকিক প্রেরণার উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাঁর ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা শুধু কথাতেই অভিব্যক্ত হয়েছে, কোন সজীব কর্মের মাধ্যমে নয়।[৮]

তিনি আরো বলেছেন :

> রাধা-কৃষ্ণ সর্বতভাবে এই মাটিরই মানুষরূপে পরস্পরকে সৃষ্টি করেছে।[৯]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের আবিষ্কারক ও সম্পাদক বসন্তরঞ্জন রায় অবশ্য এ কাব্যের অভ্যন্তরে আধ্যাত্মিকতা আছে বলে মনে করেন। পূর্বসূরিগণের দোহাই দিয়ে তিনি বলেছেন :

> ...বাহ্যত রুচি-বিরুদ্ধ হইলেও উহার অভ্যন্তরে পরম পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে, ইহাই পূর্বসূরিগণের অভিপ্রায়।[১০]

বসন্ত বাবুর এই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার নেপথ্যে বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব-পরিপুষ্ট সমকালীন সাহিত্যবোধ বিপুলভাবে সক্রিয় ছিল, তা বলাই বাহুল্য। বসন্ত বাবুর যুগে সাহিত্যরসিকমাত্রই চণ্ডীদাসের নামে অজ্ঞান ছিলেন, এবং সেকালে পদাবলি সাহিত্যমাত্রই বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রকাশ বলে ভাবা হতো। এ কালেও এ অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে, এমন ভাবা পুরোপুরি সঙ্গত হবে না। চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্বকালের কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাব্যে বৈষ্ণবীয় জীবাত্মা-পরমাত্মা তত্ত্ব আরোপ করা এ কালের অধ্যাপক-গবেষকদের একটি সাধারণ (Common) কর্ম হিসেবেই বিবেচিত। তদুপরি বসন্তরঞ্জন চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাসকে অভিন্ন বলে জেনেছেন। ফলে তাঁর পক্ষে ভুল করাই সঙ্গত। উত্তরকালের গবেষকগণ স্পষ্ট করেই বলেছেন :

> ... কোনো প্রকার ধর্মীয় প্রেরণাজাত নয় ...সাধারণ মানব মানবীর প্রেমলীলাই তাঁর কাব্যের মুখ্য উপজীব্য বিষয়।[১১]

ঘটনাবিরল হলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কাহিনী রোমাঞ্চকর, উপভোগ্য। সুকুমার সেনের ভাষায় :

> শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলিতে কৃষ্ণ-বলরামের অবতার গ্রহণ সূত্র হইতে কৃষ্ণের মথুরাগমন অবধি বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে শুধু রাধার প্রতি কৃষ্ণের আকর্ষণ নানা ছলে উভয়ের মিলন এবং রাধার প্রেমে বিতৃষ্ণা হইয়া কৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগ-- এই ঘটনাগুলিকেই আশ্রয় করিয়া প্রাকৃত প্রেমের আকর্ষণ-বিকর্ষণ নাটের ঠাটে উপস্থাপিত।[১২]

রাধার বিরহ দিয়েই কাব্য শেষ হয়েছে। পুঁথির শেষ দিকে দেখা যায় : কৃষ্ণ কংসকে হত্যার জন্য মথুরা চলে গেছেন। রাধা কৃষ্ণবিরহে আকুল হলে বড়ায়ি কৃষ্ণকে আনতে মথুরা অবধি যান। তাদের সাক্ষাতও হয়। বড়ায়ি বিরহিণী রাধার অবস্থা বর্ণনা করে তাকে বৃন্দাবনে ফিরে আসার জন্য অনেক অনুনয় করেন কিন্তু কৃষ্ণ রাজি হলেন না। তিনি স্পষ্ট করে বড়ায়িকে জানিয়ে দেন, রাধাকে আর তিনি চোখের দেখাও দেখতে চান না। এরপর পুঁথি খণ্ডিত।

যে কৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে-- যেভাবেই হোক, রাধাকে ভোগ করতে চেয়েছেন : তাম্বুলখণ্ডে রাধাকে তুষ্ট করার জন্য বড়ায়ির মাধ্যমে পান-ফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন,

দানখণ্ডে শুল্ক আদায়ের উসিলায় সারাদিন মাঝবৃন্দাবনে পথ আটকে রেখে সন্ধ্যা বেলায় এক রকম জোর জবরদস্তি করেই তিনি রাধার দেহ ভোগ করেছেন, নৌকাখণ্ডে মাঝি সেজে নদী পার করানোর ছলে মাঝ নদীতে নৌকা ডুবিয়ে তিনি পানির ভেতরেই অপ্রস্তুত, ভীত-সন্ত্রস্ত রাধাকে ভোগ করেছেন, ভারখণ্ডে রাধার ভার বয়েছেন তিনি তার সঙ্গ ও আলিঙ্গন কামনায়, ছত্রখণ্ডে তিনি রাধার মাথায় ছাতা ধরেছেন বিনিময়ে তার দেহসঙ্গ পাবেন এই আশায়, কালিয়দমনখণ্ডে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করলেন রাধার সঙ্গে নির্বিঘ্নে জলকেলি করবেন ভেবে; রাধাপ্রেমে এমনি আকুল সেই কৃষ্ণ কেন শেষে (বিরহখণ্ডে) রাধার মুখ পর্যন্ত দেখতে চাইছেন না? এর কার্যকারণ কী? কেন তাদের মিলন হলো না? এই বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল কি-না, তা আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে চাই রাধা-কৃষ্ণের বিচ্ছেদের কারণ অনুসন্ধানই আমাদের লক্ষ্য। আমরা আমাদের বর্তমান প্রবন্ধে দেখাতে চাই যে, রাধা ও কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, তাদের ব্যক্তিত্বের ধরনও ভিন্ন। সমাজচেতনা, লোকচরিত্রজ্ঞান, এবং সর্বোচরি প্রেমানুভূতি তাদের ভিন্ন ভিন্ন রকম। তাই তাদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই ব্যক্তিত্বের সংঘাতের কারণেই কাব্যের শেষে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয় নি-- হওয়া সম্ভবও ছিল না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য সতর্কভাবে পাঠ করলে দেখা যায় : কেন্দ্রীয় চরিত্র রাধা ও কৃষ্ণ পরস্পরের দিকে বিপ্রতীপ কোণে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছেন। কাব্যের শুরুতে কৃষ্ণ রাধাকে প্রবলভাবে কামনা করলেও রাধা সে মিলনে একান্তভাবে অনিচ্ছুক। দানখণ্ডে, নৌকাখণ্ডে, ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে রাধা-কৃষ্ণের দূরত্ব কমে এসেছে-- রাধা কৃষ্ণের প্রেমে ধরা দিকে শুরু করেছেন, রাধা ক্রমশ প্রবলভাবে কৃষ্ণকে অনুভব করেছেন। কাহিনীর মধ্যভাগে, বৃন্দাবনখণ্ডে, দুজনের প্রত্যাশা-কামনা-বাসনা একাকার হয়ে গেছে। বড়ু চণ্ডীদাস যদি মিলনান্তিক কাব্য রচনা করার পরিকল্পনা করতেন, তবে বৃন্দাবনখণ্ডেই কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটতো। কারণ ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে রাধা কিছু ছলাকলা-- স্ত্রীচরিত্রসুলভ তারল্যমিশ্রিত পরিহাস--করলেও বৃন্দাবনখণ্ডে এসে তিনি কৃষ্ণের কাছে দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। নারীদেহ সম্পর্কে কৃষ্ণের যত অভিজ্ঞতাই থাক না কেন, নারীচরিত্র সম্পর্কে কৃষ্ণের কোন অভিজ্ঞতাই ছিলো না। নারীকণ্ঠের অনেক নঞর্থক উক্তি যে প্রকারান্তরে সদর্থকতা প্রকাশ করে, এ দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা উদঘাটন দূরে থাক, নারীর বুক ফাটলেও অনেক সময়েই মুখ যে ফোটে না, তাও না হয় অজানা থাকুক, কিন্তু নারীসুলভ সাধারণ রঙ্গ-রসিককতা বোঝার সামান্যতম ক্ষমতাও কৃষ্ণের ছিল না। পরিহাসতরল, রঙ্গপ্রিয় রাধাকে তাই তিনি বুঝতে না পেরে তার ওপর অভিমান করেন এবং ক্রমে ক্রমে তার এই অভিমান ক্ষোভে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত এই ক্ষোভ-কোপ বিতৃষ্ণায় পরিণত হয়। কালিয়দমনখণ্ডে, যমুনাখণ্ডে রাধার রঙ্গপ্রিয়তা ও ছলচাতুরি কৃষ্ণের কাছে মনে হয় রাধার বিরাগের বহির্প্রকাশ। হারখণ্ডে রাধা যখন কৃষ্ণের মায়ের নিকট কৃষ্ণের বিরুদ্ধে হার চুরির এবং লাম্পট্যের অভিযোগ

তোলেন, তখন কৃষ্ণের কোপ এবং ক্ষোভ সীমা ছাড়িয়ে যায়। বাণখণ্ডে তাই তিনি বাণ মেরে রাধাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। বংশীখণ্ডে রাধা আবার বাঁশি চুরি করে মুখরা নারীর মতো কচাল শুরু করলে তার প্রতি কৃষ্ণের বিতৃষ্ণা চরমে ওঠে। বিরহখণ্ডে কৃষ্ণের এই রাধাবিরাগ প্রশমিত হয় নি বরং তা আরো উগ্র হয়ে উঠেছে বলেই কাব্যের শেষ পদে বড়ায়িকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ জনমে রাধার মুখ আর তিনি দেখবেন না। রাধাপ্রেম থেকে কৃষ্ণের রাধাবিরাগে অবতরণের এই হচ্ছে ইতিবৃত্ত।

এবার কৃষ্ণবিরাগ থেকে রাধার কৃষ্ণপ্রেমে উত্তরণের কারণ নির্দেশ করা যাক : রাধা এগারো বছরের বালিকাবধূ; স্বামী আইহন ঘোষ নপুংসক বলে পুরুষের যৌনসঙ্গসুখ তিনি পান নি। দেহমনে তিনি অপরিণতা ও অনভিজ্ঞা। তাই তাম্বুলখণ্ডে বড়ায়ির মাধ্যমে কৃষ্ণ যখন তাকে পান-ফুল পাঠিয়ে প্রেমের প্রস্তাব দিলেন, সঙ্গত কারণেই তিনি কৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দেননি। কৃষ্ণের পাঠানো পান-ফুল তিনি পা দিয়ে মাড়িয়ে দেন, কৃষ্ণের পক্ষ হয়ে বড়ায়ি পুনর্বার অনুরোধ করলে রেগে গিয়ে তিনি তাকে চড় মারেন। বড়ায়ি এর প্রতিশোধ নিতে চাইলেন। পরবর্তী দানখণ্ডে এবং নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ যথাক্রমে শুল্ক আদায়কারী ও মাঝি সেজে এক রকম জোর জবরদস্তি করে রাধাকে ভোগ করেছেন। কৃষ্ণের এই পরিকল্পনাগুলোতে বড়ায়ির অনুপ্রেরণা, সায় ও সহযোগিতা ছিল। দানখণ্ডে শরীরী মিলনে রাধা আনন্দ না পেলেও নৌকাখণ্ডে পেয়েছিলেন। নৌকাখণ্ড থেকেই রাধার কামনার উন্মেষ ও বিকাশ দেখা যায়, যা তাকে কৃষ্ণের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। নপুংসক স্বামীর কাছ থেকে মিলনানন্দ বঞ্চিতা রাধা কৃষ্ণকে তার যৌবনের সাথী করে নিতে চান। ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে রঙ্গরস করেছেন, তাকে দিয়ে যথাক্রমে ভার বহিয়েছেন ও ছাতা ধরিয়েছেন কিন্তু বিনিময়ে পূর্বপ্রতিশ্রুত দেহসঙ্গ দান করেন নি। রাধা যে আপাতদৃষ্টিতে ছলনা করেছেন, তার মূল অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা দেখি : তিনি উন্মুক্ত, জনাকীর্ণ রাস্তায় কোন নিরাপদ স্থান (Safe house) পান নি, তাই কৃষ্ণকে দেহসঙ্গ দান করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মিলনে বঞ্চিত কৃষ্ণ দুঃখ পেয়েছেন, বঞ্চিতা রাধাও কম দুঃখ পান নি। দানখণ্ডে মিলন হয়েছে নির্জন মাঝ বৃন্দাবনে, নৌকাখণ্ডে মিলন হয়েছে মাঝ নদীতে জলের ভেতর; ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে সে রকম নির্জন জায়গা কোথায়? তাই রাধা ছলনা করেন। কৃষ্ণ মূল সমস্যা বুঝতে পারেন না বলে রাধার ওপর রাগ করেন। বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের বিলাসকুঞ্জে রাধা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করেন। তাদের মিলন হয়।

রাধা রঙ্গরসপ্রিয়। প্রেমাস্পদের সঙ্গে প্রেমানন্দ পরিপূর্ণভাবে অনুভব করার জন্য তার সঙ্গে বিচিত্র ও বহুমুখী সরস ছলাকলা করতে তিনি ভালবাসেন। যমুনাখণ্ডে, হারখণ্ডে, বাণখণ্ডে ও বংশীখণ্ডে তাই তিনি তার প্রেমিকপুরুষ কৃষ্ণের সঙ্গে রসকচাল জুড়ে দেন এবং অন্তরশায়িত প্রেমকে তিনি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। আমরা আগেই বলেছি, কৃষ্ণ নারীর ছলাকলার মর্মার্থ বুঝতে পারেন না, তাই তিনি রুষ্ট হন।

এগিকে কৃষ্ণকে আপাতভাবে রাগিয়ে দিয়ে রাধা মনের গভীরে তার প্রেমকে আরো প্রবলভাবে অনুভব করেন বিরহখণ্ডে রাধাকে ভুল বুঝে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলে রাধার কৃষ্ণপ্রেম প্রবলতম রূপ ধারণ করে।

প্রায় সকল সমালোচকই মতৈক্যে পৌঁছেছেন যে, রাধা চরিত্র নির্মিতিতে বড়ু চণ্ডীদাস বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে রাধা চরিত্রের যে ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন তিনি নির্মাণ করেছেন, তা যুগবিরল ও তুলনারহিত বিশিষ্ট কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

ক. ...রাধা চরিত্রে বিকাশে ও পরিণতিতে কবি যে দক্ষতা ও চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন তাহা পুরানো বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। তাম্বুল খণ্ডে যে 'চন্দ্রাবলী রাহী'র সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হইল, সে সংসারানভিজ্ঞ রূঢ় সত্যভাষিণী, অল্পবয়সী, অশিক্ষিত গোপবালিকা। কিন্তু ঘটনা-কৌশলে মূঢ় বালিকাচিত্তে কামের ও প্রেমের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া কবি যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন, তখন দেখি সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বতরসিকচিত্তবলভীর পৌঢ়পারাবতী শ্রীধারায় পরিণত হইয়াতে তাহা জানিতে পারি নাই।[১৩]

খ. রাধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি আছে। ...পদাবলীর রাধাকে দূর থেকে শ্রদ্ধা জানাই কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করতে সাহস হয় না, ভরসা পাই না। মনে হয় এ রাধিকা স্বর্গ বৃন্দাবনের অধিবাসী, ইনি আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা চন্দ্রাবলী আমাদেরই একজন। আমাদের মতো সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠিতা, আমাদের মতো কামনা-বাসনা তাঁর আছে কিন্তু কুল হারাবার ভয়ও কম নেই। তাঁর ভয়, লজ্জা, ক্ষোভ, অসহায় অবস্থা তাঁকে অধিকতর মানবিকগুণে ভূষিত করেছে।[১৪]

গ. তিনটি চরিত্রই জীবন্ত ও স্বাভাবিক। তার মধ্যে রাধা চরিত্র অনন্য। ...রাধার মন-মেজাজের ক্রম বিকাশ চিত্রিত করাই যেন কবির মৌল উদ্দেশ্য ছিল।[১৫]

ঘ. তার কিশোরী মনের নীতিগত সংস্কার ও লোকলজ্জা পেরিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে রতির মানস বিবর্তনটি কবি বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।[১৬]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চরিত্রসৃষ্টি বিষয়ক আলোচনায় সমালোচকেরা রাধাকে নিয়ে যতোটা স্তুতিমুখর, কৃষ্ণ চরিত্রের নিন্দায় তাঁরা তার চেয়ে অনেক বেশি উচ্চকণ্ঠ। কৃষ্ণ চরিত্র নিয়ে সমালোচকদের কটূক্তির কারণ সম্ভবত এই যে, ধর্মগ্রন্থাদি ও পুরাণে দেবতা কৃষ্ণের যে দেবতাসুলভ মহিমা ও চরিত্রমাধুরীর পরিচয় পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে সে সব দেবোচিত গুণাবলি রক্ষিত হয় নি। এ কাব্যের নায়ক ধূর্ত, সুবিধাবাদী, গোঁয়ার, লম্পট রাখাল বিশেষ। তাই তাঁদের এ ক্ষোভ। কৃষ্ণ চরিত্র বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচকদের কিছু মন্তব্য স্মর্তব্য :

ক. যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে প্রামাণিক এবং মূল্যবান সাহিত্য গুণান্বিত কাব্য বলিয়া মনে করেন, তিনিও কৃষ্ণচরিত্রপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িবেন।[১৭]

খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণচরিত্রে আদ্যন্ত যে অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে...[১৮]

গ. বড়ুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণচরিত্রে পূর্ণতা নাই, সঙ্গতি নাই, কৃষ্ণের আচরণের বিরুদ্ধে রসগ্রাহী পাঠকচিত্তে শুধু একটা বিরক্তিকর বিরূপতা জাগিয়ে ওঠে...[১৯]

ঘ. পরবর্তীকালে জনরুচি হইতে এই কাব্যের বহিষ্কৃত হইবার প্রধান কারণ আদিরসাত্মক স্থূলতা নহে-- কৃষ্ণচরিত্রের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য।[২০]

ঙ. কবি কৃষ্ণচরিত্রের সুবিচার করতে পারেননি। ...তাই তাঁর চরিত্র চরিত্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।[২১]

চ. কৃষ্ণ চরিত্র দ্বন্দ্বহীন, একঘেয়ে।[২২]

ছ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র হিসাবে কৃষ্ণ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, সে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি চিত্রের নায়ক হিসাবেই কাব্যে উপস্থাপিত হইয়াছে। রাধা চরিত্রের যে অপূর্ব ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, কৃষ্ণ চরিত্র সেভাবে কোনো সময়েই গড়িয়া উঠে নাই।[২৩]

রাধাপ্রেম দিয়ে শুরু করলেও বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ কেন রাধাবিরাগে উপনীত হয়েছিলেন, তা ইতঃপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন থেকে পাঠ উদ্ধৃত করে আমরা দেখাবো যে রাধার মতো কৃষ্ণও একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বের কারণেই তাদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মিলন হয় নি। আমরা আরো দেখাবো যে, রাধা চরিত্রে যে রকম বিবর্তন আছে, কৃষ্ণের চরিত্রেও তা পুরোপুরি বিদ্যমান। একজন কৃষ্ণবিরাগ দিয়ে শুরু করে কৃষ্ণপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, অন্যজন রাধাপ্রেম দিয়ে শুরু করে অবশেষে রাধাবিরাগে অবতীর্ণ হন। Negative character নিয়ে যাঁদের সংস্কার/বীতরাগ বদ্ধমূল, এবং একই সঙ্গে যাঁরা ভুলে যান যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একটি কাব্যগ্রন্থমাত্র, কোন পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নয়-- কেবল তাঁরাই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের কৃষ্ণ চরিত্র পাঠ করে বিব্রত হবেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের মূল দ্বন্দ্বই হচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তির মানবগঠনে তথা ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে বংশগতি, পারিবারিক সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, পরিবেশ এবং শিক্ষাদীক্ষা সমন্বিতভাবে প্রভাব ফেলে।

লক্ষী এবং হরি অবতার হিসেবে যথাক্রমে রাধা ও কৃষ্ণ নামে পৃথিবীতে জন্ম নিলেও দুজন জন্ম নিয়েছেন দুটি ভিন্ন পদমর্যাদাবিশিষ্ট পরিবারে। রাধা জন্ম নিলেন বৃন্দাবনের সাধারণ গোয়ালা পরিবারে, কৃষ্ণ জন্ম নিলেন রাজ পরিবারে, দৈবকীর গর্ভে— যদিও তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন নন্দ-যশোদার পুত্র পরিচয়ে বৃন্দাবনের আরেক গোয়ালা পরিবারেই।

পারিবারিক আভিজাত্যের এই তারতম্য ছাড়াও রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে অর্থনৈতিক অসমতাও লক্ষ করা যাবে। রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই গোয়ালা পরিবারের সন্তান। তাই সঙ্গত কারণেই বংশগতভাবে গবাদি পশুপালন এবং দুধসহ নানা উপজাত পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট। রাধাদের পরিবারে দৈনিক যে পরিমাণ দধিদুগ্ধ উৎপাদিত হয়, তা তিনি একাই মথুরার হাটে বিক্রয় করতে নিয়ে যান। তার

সঙ্গে তার শাশুড়ি বা ননদিনী কেউ যান না। বড়ায়ি তার সঙ্গী অশক্ত বৃদ্ধা হলেও তিনি তার সামর্থ্য মতো পশরা বহন করেন। ভারখণ্ডে দেখা যায় : রাধা বড়ায়ির পশরাও কৃষ্ণের ওপর চাপিয়েছেন। বড়ায়িকে রাধার ভারবাহক হিসেবে গণনায় আনলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, রাধাদের পরিবারে উৎপাদিত দধিদুগ্ধ দুজনেই বহন করা সম্ভব। এবার কৃষ্ণ-পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুমান করা যাক। বড়ায়ি প্রথম যখন মাঝ বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে দেখেন, তখন তিনি 'শতসংখ্য গাই' চরাচ্ছিলেন। বাস্তব নিরিখে অনুমান করা চলে : রাধা ও বড়ায়ি দুজনে মিলে যে দধিদুগ্ধের পশরা নিয়ে হাটে যান, তাতে তাদের পরিবারে গাভীর সংখ্যা ৪/৫টির বেশি হবার কথা নয়। অপর দিকে কৃষ্ণ-পরিবারে গাভীর সংখ্যা শতাধিক।

কৃষ্ণকে গরুর রাখাল ভাবাও সঙ্গত হবে না। কেবল তাম্বুলখণ্ডেই তাকে দেখা গেছে গরু চড়াতে। অন্যান্য খণ্ডে তাকে দেখা গেছে রাধার আশেপাশে তার সঙ্গলাভের আশায়; কখনো একাকী বিশ্রাম নিতে অথবা ঘুমাতে অথবা বাঁশি বাজাতে। এ সময় এতগুলো গরু দেখাশোনা অথবা চারণ করেছে কে বা কারা? নিশ্চয়ই গরু চরানোর আরো লোক ছিলো। আমাদের অনুমান : তিনি পেশাদার রাখাল নন, হয়তো তাদের গরুগুলোর দেখাশোনা (Supervise) করাই ছিলো তার কাজ। বোঝাই যায় : যথেষ্ট আরাম আয়েশে তিনি প্রতিপালিত তাই ভারখণ্ডে তিনি ভার তৈরি করলেও রাধার ভার বহনে তার অনিচ্ছা ও দ্বিধা খুব স্পষ্ট। রাখা নিজেই ভার বহন করেন। কৃষ্ণদের পরিবারে এসব কাজ করানোর জন্য মনে হয় ভিন্ন লোক ছিলো। কৃষ্ণ ভার বহনে অনভিজ্ঞ এবং কাজটি তার পক্ষে শোভন হবে না ভেবে তিনি ভার বহন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। যশোদার প্রতি কৃষ্ণের উক্তিতে বিস্তর মিথ্যা কথা আছে, তবে তার 'দুই কান্ধ ফুলায়িল বহায়িআঁ দধিভারে' উক্তিটি বোধ হয় সত্যভাষণ। কৃষ্ণ অনভ্যস্ত, তাই রাধার বার বহন করে তার দুই কাঁধ ফুলে গিয়েছিলো। আমাদের বিবেচনা : রাধা সরাসরি শ্রমের সঙ্গে যুক্ত, শ্রমিক ; কৃষ্ণ মধ্যস্বত্বভোগী--সুতরাং রাধার তুলনায় কৃষ্ণ অধিকতর আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান।

বংশগত ও অর্থনৈতিক তারতম্যের জন্য রাধা কৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের গঠন তাই দু রকম। রাধা মধ্যবিত্ত গোয়ালা পরিবারের সন্তান এবং বিশেষ করে মেয়ে বলে সমাজের অনুশাসন তাকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখে। অপর দিকে কৃষ্ণের শরীরে রাজরক্ত, অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের সন্তান এবং বিশেষ করে ছেলে বলে তিনি জেদি, একরোখা স্বভাবের। সমাজের পরোয়া তিনি করেন না। লোকলাজ, ভয় ইত্যাদি তার নেই বললেই চলে। তিনি যা চান, তা যেভাবেই হোক হাসিল করতে চান, এবং কোনো কারণে তা করতে না পারলে তার মনে ক্রোধ জন্মে।

আপাতদৃষ্টিতে খণ্ডে খণ্ডে কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন বলে মনে হলেও রাধা-কৃষ্ণের প্রেম, তাদের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব এর মূল সূত্র রচনা করেছে।[২৪] 'রাধা-কৃষ্ণের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক'[২৫] যেমন কাহিনীকে নির্মাণ করেছে, তেমনি এ কাব্যে 'উন্মোচিত হয়েছে নরনারীর মনস্তাত্ত্বিক ভিন্নতা।'[২৬]

কাব্যের শুরুতে রাধা কিশোরী বালিকা তার বয়স মাত্র এগারো বছর দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নপুংসক আইহন ঘোষের স্ত্রী স্বামী নপুংসক বলে পুরুষের যৌনসঙ্গসুখ কেমন তা তিনি জানেন না বয়স নিতান্ত কম বলে এ বিষয়ে তার বিশেষ কৌতূহলও সৃষ্টি হয় নি।

একদিন দধিদুগ্ধ নিয়ে মথুরা যাবার পথে বড়ায়ি রাধাকে হারিয়ে ফেলেন। রাধাকে খুঁজতে গিয়ে তার সঙ্গে কৃষ্ণের দেখা হয়ে যায়। কৃষ্ণের কাছে বড়ায়ি রাধার খোঁজ জানতে চাইলে তিনি রাধার বর্ণনা দিতে বলেন বড়ায়ি তখন রাধার রূপ বর্ণনা করেন। বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ মুহূর্তেই রাধার প্রেমে পড়ে যান এবং বড়ায়ির মাধ্যমে পান-ফুল পাঠিয়ে তার কাছে প্রেমের প্রস্তাব দেন। রাধা ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কৃষ্ণের পাঠানো উপহারসামগ্রী পায়ে মাড়িয়ে দিয়ে স্বামিগর্বে গর্বিতা রাধা বললেন :

ঘরের সামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর
আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল
তা সমে কি মোর নেহা।[২৭]
(তাম্বুল খণ্ড - ১৩)

বড়ায়ি উপর্যুপরি রাধার কাছে কৃষ্ণের কামনা বাসনার কথা বলতে থাকলে এক পর্যায়ে রাধা বিরক্ত হয়ে বড়ায়িকে গালমন্দ করেন এবং তাকে চড় মারেন। মার খেয়ে বড়ায়ি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং রাধাকে অপদস্থ করার জন্য কৃষ্ণের সাহায্য চান। কৃষ্ণ বড়ায়িকে কথা দেন :

বাটেত সৃজিয়া দান করি তার অপমান
তোর মোর সাধিব মান ॥

ছড়াইব তার ক্ষীর কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর
হাথ দিবোঁ তাহার তনে।
তোর অনুমতি লআঁ বলে রাধাক ধরিআঁ
লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে ॥[২৮]
(তাম্বুল খণ্ড - ২২)

দানখণ্ডে কৃষ্ণ তার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি রাধা-কৃষ্ণের কথা কাটাকাটি চলে। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, "কৃষ্ণের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে রাধার মনেও রতি ইচ্ছা জেগেছিল। তবে লজ্জা নির্মূল হয়নি, তাই সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা"।[২৯] রাধার মনে রতিবাসনা জাগুক বা না জাগুক, মিলতে তিনি যে কোনো আনন্দ পান নি, তা বোঝা যায় রতিমিলনের পর বড়ায়ির কাছে তার উক্তিতে :

ভাল ভৈল বড়ায়ি মোর ভৈল পরতেখ।
নিজ পতি বিহানে আবথা মোর দেখ॥
একসরী বনে ভয় পাইলোঁ আপারে।
এত দুখ দিআঁ বিধি নির্ম্মিল আহ্মারে॥

লয়িআঁ চল বড়ায়ি নিজ মোর দেশ।
সে কাহ্নাঞিঁ লাগি ভৈল পাঞ্জর শেষ॥[৩০]
(দান খণ্ড - ১১০)

লক্ষণীয়, রাধা কৃষ্ণকে রতি মিলনে যে সম্মতি দিয়েছিলেন এবং এরপর কৃষ্ণ তাকে সম্ভোগ করেছেন-- এ দুটি তথ্য রাধা চেপে যাচ্ছেন। উপরন্তু বর্ণনা করেছেন কীভাবে কৃষ্ণকে তিনি ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন :

আরতি লয়িআঁ কাহ্ন মাঝ বৃন্দাবনে।
সুরতি আন্তরে মোরে করিল যতনে॥
একসরী হআঁ দৃঢ় বান্ধিআঁ বসনে।
জীউত উপর উঠী নিবারিলোঁ কাহ্নে॥
সেকি কোপে কাঢ়ি নিলে সব আভরণে।
আর বিগুতিল মোর সব দেহ কাহ্নে॥[৩১]
(দান খণ্ড - ১১০)

রাধার এই মিথ্যা কথা মূলত তার লোকলাজ ও লোকভয় থেকে উদ্ভূত।

নৌকাখণ্ডে নৌকা ডুবিয়ে কৃষ্ণ যখন জলের ভেতর রাধার সঙ্গে রতি মিলন করেন, তখনও রাধাকে লোকলাজ, লোকভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন :

সব সখী দেখে মোর কাহ্নাঞিঁ ল
না তুলিহ জলের উপর।
. . . . . .
যে কর সে কর তুঞিঁ
মোরে জলের ভিতর।
হোর সব সখিগন
দেখে তাক মোর ডর॥[৩২]
(নৌকাখণ্ড - ২৬)

এবার মিলনে রাধা আনন্দ পেয়েছেন। কবির বর্ণনা :

রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।
উরস্থলে কৈল রাধা দৃঢ় আলিঙ্গন॥
. . . . . .
রাধার নিতম্বে কাহ্নাঞিঁ দিল ঘন নখে।
চমকি করিল রাধা আতি রতি সুখে॥[৩৩]
(নৌকাখণ্ড - ২৭)

বড়ায়ির কাছে দেহমিলনান্তে রাধার এবারের যে বিবৃতি তাতে দেখা যাচ্ছে : কৃষ্ণের প্রতি তার কোনো ক্ষোভ নেই বরং কৃষ্ণের প্রতি তার কৃতজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়েছে। রাধা এবার বিবৃতি দেন এই বলে :

আচম্বিত খরতর বাহিলেক বায়।
মাঝ যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ॥

ডুবিআঁ মরিতেঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে।
আহ্মা লআঁ সান্তারিআঁ রাখিল পরাণে॥
এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার।
জনমেঁ সুঝিতেঁ নারোঁ এ গুন তাহার॥[৩৪]
(নৌকাখণ্ড - ২৯)

দেখা যাচ্ছে এবার রতি মিলনে আনন্দ পাবার পর রাধার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাচ্ছে। রাধা এবারের মিলনের কথাও বড়ায়ি বা আর কাউকে যে বলেন নি সে তার লোকলাজেরই বহির্প্রকাশ।

ভারখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার সঙ্গী হতে চান কিন্তু ভার বহনে তার অনিচ্ছা প্রবল। কাজটি তার জন্য সম্মানজনক বলে তার কাছে মনে হয় নি। আমরা আগেই জানিয়েছি, ভারবহনে কৃষ্ণ অভ্যস্ত নন তদুপরি দেবত্বের অহমিকায় তিনি অন্ধ। তাই তাকে বলতে শুনি :

কংস বধিবারে মোএঁ কৈলোঁ আবতার।
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার॥
দধি দুধ বিচি তোর বিপরীত মতী।
তেঁসি না চিহ্নসি আহ্মা দেব অধিপতি॥
গোআলার ঝি তোহ্মে বড় আদিছরী।
তেকারণে ভার বহায়িতেঁ চাহা হরী॥
যৌবনগরবেঁ বোল এ সব উত্তর।
তাহাক শুনিতেঁ কোপ উপজে অন্তর॥[৩৫]
(ভারখণ্ড - ১০)

দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণের মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। আত্মঅহমিকা প্রচার করা কৃষ্ণের একটি প্রধান চরিত্রবৈশিষ্ট্য। গোপাল হালদার স্পষ্ট করেই বলেছেন : "শ্রীকৃষ্ণ আপনার দেবত্বের যত বড়াই করুক, সে ধূর্ত এক গ্রাম্য-লম্পট ছাড়া আর কিছুই নং।"[৩৬] তাই দেখা যায় : রাধা কৃষ্ণকে যখন 'ভার বইলে কথা শুনবো' জাতীয় আশ্বাস দিলেন, অমনি কৃষ্ণ 'মনের উল্লাসে' ভার বহন শুরু করেন :

মিছা অলঞ্জাল তেজ বহ দধিভার।
মনসুখ ভৈলেঁ বোল ধরিব তোহ্মার॥
এ বোল সুনিআঁ কাহ্নাঞিঁ মনের উল্লাসে।
ভার লএ উলটিআঁ চন্দ্রাবলী হাসে॥
ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহিঁ টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবোঁ মাগুকিলে॥[৩৭]
(ভারখণ্ড - ১২)

এ পদে রাধার মুখ টিপে হাসা এবং মেয়েলি কিলের ভয় প্রদর্শন তার রঙ্গরসপ্রিয়তা ও কৃষ্ণানুরাগের বহির্প্রকাশ।

ভার বহনের সময় কৃষ্ণ স্পষ্টতই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন-- রাধার সঙ্গে রতি মিলনের আশায় তিনি ভার বইছেন বটে কিন্তু এ কাজে তার মন সায় দিচ্ছে না : ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে চূর্ণ হয়ে এক পর্যায়ে কৃষ্ণ ভার নামিয়ে রাধার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন :

মায়া পাতী কৈল মোর বড় অপমান।
কিছু কাজ নাহিঁ মোর দেউ মাহাদান॥
এড়িল বড়ায়ি হের দধির পসার।
আর শির তুলী মুখ না দেখিব তার॥[৩৮]
(ভারখণ্ড - ১৫)

আবারও কৃষ্ণ রেগে যাচ্ছেন। তিনি মূলত রাধার রতি মিলন চান কিন্তু রাধাও কম সেয়ানা নন, তিনি ভার বহন করিয়েও কৃষ্ণকে দেহসঙ্গ দান করলেন না; কথা ঘুরিয়ে বললেন ফেরার পথে তোমাকে রতিসঙ্গ দেবো। বিনা দুঃখে সুখলাভ হয় না, বিশ্বাস না হয় বড়ায়িকে জিজ্ঞাসা করে দেখো-- এ জাতীয় আপ্তবাক্য আওড়ালেন তিনি। রেগে গিয়ে তখন কৃষ্ণ বললেন :

কি পুছিব বড়ায়ি রাধা আহ্মে সব জাণী।
না দেখিল তোহ্মা হেন কথাহোঁ চউহালিণী।[৩৯]
(ভারখণ্ড - ২৭)

দেখা যাচ্ছে, উন্মুক্ত রাস্তায় রতিকর্মের পরিবেশ না থাকায় রাধা মুখে মুখেই রঙ্গ ধামালি করে যাচ্ছেন। ওদিকে লাভের লাভ কিছুই অর্জিত না হওয়ায় কৃষ্ণ হতাশ, ক্ষুব্ধ এবং রুক্ষ হয়ে উঠছেন। রাধার সীমাবদ্ধতা যেমন তিনি অনুভব করতে পারছেন না, তেমনি তার রঙ্গরসও তিনি বুঝতে পারছেন না। বোঝার মধ্যে তিনি মূলত রতিকর্ম বোঝেন। সেটি যখন হচ্ছে না, তখন তার মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন বলে মুখে যা আসছে, রাধাকে তাই তিনি বলছেন।

ভারখণ্ডে ও ছত্রখণ্ডে রাধা সুযোগ পান নি তাই কৃষ্ণকে রতিসঙ্গ দান করতে পারেন নি। তিনি সব কাজ গোপনে করতে চান। সখীদের এবং বড়ায়িকে এড়িয়ে কৃষ্ণকে তুষ্ট করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ছত্রখণ্ডে রাধা গাছ তলায় বিশ্রাম নেবার ছলে সুযোগ খুঁজেছেন। সব সখী একে একে চলে যাচ্ছে। তিনি সখীদের মাধ্যমে বাড়িতে খবর পাঠালেন যে, রোদ পড়লে তিনি যাবেন। সখীরা চলে যাবার পর রাধা কৃষ্ণকে বললেন :

ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ দিবোঁ সুরতী।
নহে মনে পরিহার আরতী॥[৪০]
(ছত্রখণ্ড - ৪)

রাধা নতুন নতুন শর্ত দিচ্ছেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কিন্তু তা রক্ষা করছেন না। এতে কৃষ্ণ বিরূপ হয়ে যাচ্ছেন। সখীদের এড়ালেও বড়ায়িকে এড়াতে পারছেন না বলে রাধা কৃষ্ণের ইচ্ছা পূরণ করতে পারছেন না। মন চাইছে, কৃষ্ণও চাইছেন কিন্তু সমাজের ভয়ে, লোক জেনে যাবে এই ভয়ে, রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে রতিমিলন করতে পারছেন না। কৃষ্ণ রাধাকে বুঝতে না পেরে রাধার উপর অসন্তুষ্ট হচ্ছেন। তদুপরি রাধার রঙ্গরস ও ব্যঙ্গবিদ্রূপে তার বেহাল অবস্থা :

এতেক আরতী আছে পরে কেহ্নে মাঙ্গী
বিহা করিতেঁ না জুআয় হঅ তোহ্মে যোগী॥[৪১]
(ছত্রখণ্ড - ৯)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের আন্তঃসম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড় হয়েছে বৃন্দাবনখণ্ডে বিস্তর ছলাকলা করে রাধা বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছেন কৃষ্ণের সামনে দেহমিলনে তিনি উৎসুক, কিন্তু লোকগঞ্জনা তাকে বিদ্ধ করছে। চারপাশে এতো সখী, এদের মাঝে কৃষ্ণকে কীভাবে তিনি একান্তে পাবেন, কীভাবে তার সঙ্গে রতিকর্ম করবেন-- এই ভাবনায় রাধা আকুল তাই তিনি কৃষ্ণকে সখীদের মুখ বন্ধ করার উপায় বের করতে বলেন। দেবতা কৃষ্ণ তখন বহু দেহ ধারণ করে সব সখীকে রতিসঙ্গ দিয়ে তুষ্ট করে তাদের মুখ বন্ধ করার পাকা ব্যবস্থা নিলেন তখন শ্রীমতী রাধার মেয়েলী ঈর্ষা উপভোগ্য :

সব গোপী নারী মিলিআঁ এবেঁ
কি রঙ্গসি মোর মুখেঁ॥
ভাল উপদেশ দিলোঁ মো তোরে
আপণার মতিমোষেঁ॥
এখন তাহার ফল ভুঞ্জোঁ মোত্রঁ
আপণে আপণ দোষেঁ॥
এখন আহ্মার থানক আইলাহা
মুখে তোর নাহিঁ লাজে।
পুণী সেই গোপী গণ পাস যাহা
তোহ্মে মোর নাহিঁ কাজেঁ॥[৪২]
(বৃন্দাবন খণ্ড - ১৭)

এবং তার অভিমান :

বুঝিল বুঝিল তোহ্মার মতী।
সম দেখ সকল যুবতীঁ॥

বিষম পুরুষ জাতী কঠিন হৃদয় আতী
তাক নাহি কিছু পরকার।[৪৩]
(বৃন্দাবন খণ্ড - ২৭)

অতপর কৃষ্ণের আত্মপক্ষ সমর্থন এবং বিশেষ করে রাধাপ্রেমে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ :

নানা ফুলে বুলে ভ্রমরে
আল হের সুন প্রাণ রাধা ল।
তভোঁ কি মালতী পাসরেঁ॥

. . . . . .
মন ঝুরে তোর নামে ল
সংসারত তোহ্মা কৈলোঁ সারে।[৪৪]
(বৃন্দাবন খণ্ড - ২৮)

কৃষ্ণের আত্মনিবেদনে রাধাও আপ্লুত হলেন। তার সব দুঃখ-অভিমান দূর হয়ে গেল তিনিও কৃষ্ণচরণে নিজেকে নিবেদন করলেন তাঁর উচ্চারণ নিবিড়, গাঢ়, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত :

তিরীর সভাব মণে করে
প্রাণ কাহ্নাঞি ল।
তাত রোষ না কর নাগরে॥
এ তোহ্মার বচনে
প্রাণ কাহ্নাঞি ল।
সব কোপ খণ্ডিল এখনে॥
আল হেরা॥
এহি জাগে তোহ্মার চরণে॥
প্রাণ কাহ্নাঞি ঁল
আহ্মা সব না করিহ আনে॥
. . . . . .
বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহেরা॥[৪৫]
(বৃন্দাবন খণ্ড - ২৯)

যমুনাখণ্ডে রাধা আবার তার সহজাত 'তিরীর সভাব'সুলভ ভঙ্গিতে কৃষ্ণের সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করেন, যা কৃষ্ণপ্রেমেরই বিচিত্র প্রকাশ। কৃষ্ণ নদীর ঘাটে রাধার আলিঙ্গন কামনা করেন। রাধা কৃত্রিম রাগ দেখান, তার সঙ্গে রসকলহ জুড়ে দেন। পরিহাসজ্ঞানহীন কৃষ্ণ ভাবেন : রাধা বুঝি তার সাথে খারাপ ব্যবহার করছেন। বড়ায়ির কাছে অভিযোগ করে তিনি বলেন :

রাধা সমে নেহা ভৈল তোহ্মার বিদিত।
তবে কেহ্নে রাধা বোলে মোরে বিপরীত॥
মোঞঁ নাহি করোঁ তার ঠায়ি কিছু দোষে।
না জাণো নিঠুর রাধা বোলে কোণ রোষে॥[৪৬]
(যমুনাখণ্ড - ৫)

অবোধ কৃষ্ণ রাধার প্রতিও বলেন :

কিছু নাহিঁ করোঁ আপরাধা।
তভোঁ কোপ তোর এ বড় ধান্ধা॥
না বোল না বোল রুখ বাণী।[৪৭]
(যমুনাখণ্ড - ৮)

রাধা প্রকাশ্যে সবার সামনে কৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দিতে চান না। কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন তিনিও চান, তবে তিনি চান : তা হোক গোপনে, যাতে কেউ কিছু জানতে না পারে। কৃষ্ণের প্রতি তার উক্তিতে তাই মিশে থাকে ভর্ৎসনা, অনুরোধ, অনুরোধ ও উপদেশ :

ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতে জুআএ॥
যেহ্ন তোহ্মে গোপ কথা করহ বিকাশ।
বুঝিল তোমার কাজে নাহিঁ কিছু ভাষ॥[৪৮]
(যমুনাখণ্ড - ১১)

হারখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের মায়ের কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে হার ছিনিয়ে নেওয়ার এবং লাম্পট্যের অভিযোগ কেন করলেন, তা অস্পষ্ট। যে রাধা সব সখীর সামনে এমন কি বড়ায়ির সামনেও কৃষ্ণের সঙ্গে সংযত আচরণ করেন, যাতে তাদের প্রণয় এবং রতিমিলনের কথা কেউ জানতে না পারে-- সেই রাধা হার ফিরে পাবার আশায় খোদ কৃষ্ণমাতা যশোদার কাছে নালিশ করবেন, এমন ভাবনার পেছনে যুক্তি দুর্বল। মায়ের কাছে নালিশ করায় কৃষ্ণ রাধার ওপর বিশেষভাবে রুষ্ট হন। তিনি রাধাকে পুষ্পবান মেরে সমুচিত শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা করেন। বাণখণ্ডের প্রথম পদেই কুপিত কৃষ্ণ দুই বার দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেন : 'আজি হৈতেঁ রাধকাত নিবারিলোঁ মণে'। বড়ায়ির উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ বলেছেন :

গোচরিল রাধা মোর মাএর চরণে।
তেকারণে পায়িল আপমাণে॥
বড়ায়ি ল।
আজি হৈতে রাধিকাত নিবারিলোঁ মণে।
. . . . . .
আহ্মার করিল রাধা বড়ায়ি খাঁখার।
আবসি করিবোঁ প্রতিকার॥
আপণে করিব আহ্মে তেহেন উপাএ।
যেহ্ন রাধা পরে মোর পাএ॥
মরমে হানিবোঁ তারে মনমথবাণে।
নিবেদিলোঁ তোহ্মার চরণে॥
সব লোকেঁ হাসে যেহ্ন দিআঁ করতালী।
তেহ্ন তারে করায়িবোঁ বিকলী॥
আহ্মার মনত জাগে অতি বড় রোষে।
তোহ্মে মোক নাহিঁ দিহ দোষে॥[৪৯]
(বানখণ্ড - ১)

আমরা দেখি : বাণখণ্ড থেকে কৃষ্ণ রাধার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এ পর্যায়ে থেকে রাধাকে তিনি এড়িয়ে চলতে চেয়েছেন-- আর একবারও রাধার সাথে তিনি উপযাচক হয়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেন নি, বরং তার সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে

সচেষ্ট হয়েছেন তার নিক্ষিপ্ত পুষ্পশরে রাধা মূর্চ্ছা গেলে তার মৃত্যু হয়েছে ভেবে কৃষ্ণ যে বিলাপোক্তি শুরু করেন, তার মধ্যে সমালোচকদের কেউ কেউ[৫০] আন্তরিকতা খুঁজে পেলেও কেউ কেউ[৫১] সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমাদের মনে হয় : ঘটনার আকস্মিকতায় কৃষ্ণ ঘাবড়ে গিয়ে বিলাপ জুড়ে দেন। তার এসব উক্তির মধ্যে আন্তরিকতা থাকলে পরবর্তী খণ্ড দুটিতে তিনি রাধার প্রতি নমনীয় আচরণ করতেন। কিন্তু বাণখণ্ড থেকে কৃষ্ণ চরিত্রে রাধাবিরাগ প্রবল হবার পর আর তার মধ্যে রাধাপ্রেম জাগ্রত হতে দেখা যায় নি। তাই আমরা মনে করি : কৃষ্ণের বিলাপ কৃত্রিম এবং এ খণ্ডে তাদের দেহমিলন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

কৃষ্ণকে বশে আনার জন্য বংশীখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের বাঁশি চুরি করলে তা তার জন্য হিতে বিপরীত হয়েছে। কৃষ্ণ এ ঘটনায় আরো কুপিত হয়েছেন। এ খণ্ডে ষোল শ গোপনারীর প্রত্যেকের কাছে জোড়হাত করে কৃষ্ণ চরম বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। তার বিতৃষ্ণা চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বড়ায়ি যখন কৃষ্ণের কাছে প্রস্তাব দেন :

ষোল শত রাধার সঙ্গিনী। আল।
তার থান চলহ আপুণী॥ ল কাহ্নাঞি॥
একেঁ একেঁ কর ষোড়হাতে। আল।
তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে॥ ল কাহ্নাঞি॥[৫২]
(বংশীখণ্ড - ৩৭)

প্রস্তাব শুনে কৃষ্ণ বলেছেন :

ত্রিদশগণের আহ্মে নাথ। আল
কেমণে করিব ষোড়হাত॥ ল বড়ায়ি॥
এত বড় মোর আপমাণে। আল।
সুণি কি বুলিব দেবগণে॥ ল বড়ায়ি॥[৫৩]
(বংশীখণ্ড - ৩৭)

প্রিয় বাঁশিটি ফেরত পাবার জন্য কৃষ্ণ অগত্যা প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোপনারীদের কাছে জোড়হাত করলেন। এ পর্যায়ে কৃষ্ণ মনের রোষ মনে চেপে রেখে রাধাকে ক্ষমা করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দান করেন। বাঁশি ফেরত দেবার সময় রাধা বলেছিলেন :

বিরহেঁ আকুলী যবেঁ চাহোঁ মো তোহ্মারে।
তখন আসিহ তোহ্মে আতি অবিচারে॥
হের ভালমতেঁ চাহি নেহ কাহ্নাঞিঁ বাঁশী।
আজি হৈতেঁ চন্দ্রাবলী হৈল তোর দাসী॥[৫৪]
(বংশীখণ্ড - ৪১)

জবাবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কৃষ্ণ :

সব দোষ মরসিল তোর চন্দ্রাবলী।
আর তোর অহিত না করে বনমালী॥[৫৫]
(বংশীখণ্ড - ৪১)

রাধার প্রতি কৃষ্ণের বিতৃষ্ণা বিরহখণ্ডে প্রশমিত হয় নি রাধাকে ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি আর। পারস্পরিক ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের মাঝে এতোটাই দূরত্ব সূচিত করেছিল যে, সে দূরত্ব অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। বিরহখণ্ডে রাধা বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন এবং সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ করার জন্য তৎপর হন। কিন্তু কৃষ্ণ মুখে যা-ই বলুক না কেন, কার্যত তিনি রাধাকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। এ জন্য কৃষ্ণকে আশ্রয় নিতে হয় নানা কপটতার, নানা উসিলার :

ক. অহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রহাই॥
. . . . . .
গোআনবানে ছেদিলেঁ মদনবাণ।
তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার।
অসার দেখীলো সব সংসার॥[৫৬]
(বিরহখণ্ড - ২৯)

খ. তেজ মোর সঙ্গ নাহি মোতে রঙ্গ
আর তোহ্মার শৃঙ্গারে।[৫৭]
(বিরহখণ্ড - ৩৩)

গ. সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে॥[৫৮]
(বিরহখণ্ড - ৩৭)

ঘ. আসুর আরিআঁ খণ্ডিবোঁ পৃথিবীর ভার।
পাপ করিলেঁ সে ত নহিব আহ্মার॥[৫৯]
(বিরহখণ্ড - ৩৯)

কৃষ্ণের এসব উক্তির প্রত্যেকটিই যে ছলচাতুরি, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে : রাধার সঙ্গে রতিমিলন করা কোনোভাবেই তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না বলে এতো সব অজুহাত দেখানোর অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণ আবার রাধার সঙ্গে রতিকর্ম করেছিলেন-- অবশ্য স্বেচ্ছায় নয়, রাধার অনুনয়েও নয়, বড়ায়ির অনুরোধে। কৃষ্ণের বৈরাগ্য প্রকৃত বৈরাগ্য নয়, ভণ্ড যোগীবেশ আসলে তার আরো একটি ভাণ।[৬০]

দেহ মিলনের পর শ্রান্ত রাধা কৃষ্ণের উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লে তার নিদ্রার অবকাশে কৃষ্ণ মথুরায় চলে যান এরপর রাধা কৃষ্ণবিরহে নিতান্ত কাতর হয়ে পড়লে বড়ায়ি মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে খুঁজে বের করেন। কাহিনীর সুত্রধার হিসেবে বিরহখণ্ডের ৬৭ সংখ্যক গানের শীর্ষে স্থাপিত সংস্কৃত শ্লোকে কবি আমাদের জানান : "মথুরানগরে গিয়ে বড়াই কৃষ্ণকে বলল, বিরহে মগ্না রাধা তোমার শরণার্থী। এ কথা শুনে নাগর হরি রাধার প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত হয়ে বড়াইকে এই রুষ্টবাক্য বলল।"[৬১]

রুষ্টবাক্যের অংশবিশেষ এ রকম :

আহা।
নঠী বড় রাধা দেখিলে প্রাণ হরে।
আল।
তাহার ঠাইক জাইতেঁ লাগে বড় ডরে॥
. . . . . .
আর তার মুখ নাঁ দেখে সুন্দর কাহ্নাঞিঁ।[৬৩]
(বিরহখণ্ড - ৬৭)

বড়ায়ি তখন রাধার হয়ে মিনতি করে বলেন :

আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করী আইস বনমালী॥
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতেঁ উচিত তোর নহে।[৬৩]
(বিরহখণ্ড - ৬৮)

কিন্তু কৃষ্ণ তার সিদ্ধান্তে অনড়। রাধার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে সুস্পষ্টভাবে তিনি বলেন :

শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
জায়িতে না ফুরে মন নাম শুণী তারে॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ আর না দেখিবোঁ তারে॥
আগ বাড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী॥
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত।
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচনতাপ না সহে মুরারী॥[৬৪]
(বিরহখণ্ড - ৬৯)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের কাহিনী তিন বছর কালসীমার মধ্যে সংঘটিত।[৬৫] এই তিন বছরকাল সীমার মধ্যে কোন্ কোন্ ঘটনার মধ্য দিয়ে কীভাবে রাধা কৃষ্ণবিরাগ থেকে কৃষ্ণপ্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এবং কৃষ্ণ রাধাপ্রেম থেকে রাধাবিরাগে অবতরণ করেছেন তার বিবরণ আমরা দিয়েছি। আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি : রাধা ও কৃষ্ণের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা, তথা তাদের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব কীভাবে তাদের বিচ্ছেদকে অনিবার্য করে তুলেছে। রাধার প্রেমে বিতৃষ্ণ হয়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করেছেন,[৬৬] নির্দয় কৃষ্ণ রাধার শুধু দোষগুলিই শেষ পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন এবং সে কারণেই তাকে পরিত্যাগ করেন[৬৭]--কাহিনীর এই পরিসমাপ্তি সহৃদয় পাঠকের মেনে নিতে কষ্ট হয়।

সমালোচকদের কারো কারো[৬৮] অনুমান : খণ্ডিত গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের শেষে রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলন বর্ণিত হয়েছিল ; কারো কারো[৬৯] ধারণা ; খাণ্ড অংশে কাহিনী আর এগোয় নি। আমাদের মনে হয় : কাহিনীর শেষে রাধা-কৃষ্ণের মিলন হয় নি। কৃষ্ণচরিত্রের গতিপ্রকৃতি আমাদেরকে সে দিকেই ইঙ্গিত দান করে।

তথ্যপঞ্জি :

১ ক্ষেত্র গুপ্ত, প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, কলিকাতা, ১৪০৮, পৃ. ৩২

২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য, ঢাকা, ১৪০৭, পৃ. ৯

৩ বিমান বিহারী মজুমদার, ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ. ২৫৪

৪ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৪৬

৫ বিমান বিহারী মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫

৬ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৭ নীলরতন সেন, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৪৯৯

৮ অরবিন্দ পোদ্দার, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৪৩

৯ ঐ, পৃ. ১৪৮

১০ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কলিকাতা, ২০০০, (ভূমিকা অংশে), পৃ. ২৭

১১ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১২ সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

১৩ ঐ, পৃ. ১৪৮

১৪ নীলিমা ইব্রাহিম, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন : কাব্য পাঠের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৬, ৪০

১৫ আহমদ শরীফ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, (প্রথম খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩১৭

১৬ নীলরতন সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

১৭ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৩২৬

১৮ ঐ, পৃ. ৩২৭

১৯ ঐ, পৃ. ৩৩১

২০ ঐ, পৃ. ৩৩২

২১ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, কলিকাতা, ২০০২, পৃ. ৯৭

২২ নীলিমা ইব্রাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

২৩ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমগ্র, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৯৭

২৪ ক্ষেত্র গুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

২৫ বেগম আকতার কামাল, কবিতার নান্দনিকতা প্রাচীন ও মধ্যযুগ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৫৪
২৬ ঐ, পৃ. ৫৪
২৭ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮
২৮ ঐ, পৃ. ১১
২৯ তারাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ১০২
৩০ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪
৩১ ঐ, পৃ. ৫৪
৩২ ঐ, পৃ. ৬৪
৩৩ ঐ, পৃ. ৬৪
৩৪ ঐ, পৃ. ৬৫
৩৫ ঐ, পৃ. ৬৯
৩৬ গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, (প্রথম খণ্ড), ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৪৮
৩৭ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
৩৮ ঐ, পৃ. ৭১
৩৯ ঐ, পৃ. ৭৪
৪০ ঐ, পৃ. ৭৬
৪১ ঐ, পৃ. ৭৮
৪২ ঐ, পৃ. ৮৫
৪৩ ঐ, পৃ. ৮৯
৪৪ ঐ, পৃ. ৮৯
৪৫ ঐ, পৃ. ৯০
৪৬ ঐ, পৃ. ৯৬
৪৭ ঐ, পৃ. ৯৭
৪৮ ঐ, পৃ. ৯৯
৪৯ ঐ, পৃ. ১০৫
৫০ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮
৫১ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
৫২ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮
৫৩ ঐ, পৃ. ১২৮
৫৪ ঐ, পৃ. ১৩০

৫৫ ঐ, পৃ. ১৩০

৫৬ ঐ, পৃ. ১৪১-১৪২

৫৭ ঐ, পৃ. ১৪৩

৫৮ ঐ, পৃ. ১৪৫

৫৯ ঐ, পৃ. ১৪৬

৬০ ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৬১ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশার অনুবাদ, বিরহখণ্ডের ৬৭ সংখ্যক গানের শীর্ষে স্থাপিত কবির সংস্কৃত শ্লোক, বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

৬২ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬-১৫৭

৬৩ ঐ, পৃ. ১৫৭

৬৪ ঐ, পৃ. ১৫৭

৬৫ নীলরতন সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৬৬ সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৭

৬৭ বিমান বিহারী মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪

৬৮ ক. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫
খ. ক্ষেত্রগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৬৯ সুখময় মুখোপাধ্যায়, পুরাতন বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৬২